কম্পোজিশন; এই শীতের দিনে আজ মেঘ করে এল
মণীন্দ্র গুপ্ত

এই শীতের দিনে আজ মেঘ করে এল
বৃষ্টি হবে।
পিঁপড়েরা এখনও শীতঘুম থেকে ওঠেনি–
কোথায় ওদের ডেরা?
সেখানে যদি জল ঢুকে পড়ে!
ছেঁড়া খড়ের ধূ ধূ মাঠে কে যেন যেতে যেতে পিছু ফিরে এইসব ভাবছে।
ভয় পাওয়া দাড়াস সাপের ছিটকে ওঠা সর্পগতিতে বিদ্যুত চমকাল–
মাঠে বাজ পড়ে ধোঁয়া উঠছে।
যিশুর জন্মের আগে থেকে নদী বন পাহাড় গহ্বরের
ভাঙা গলার প্রার্থনা ওঠে–
ইলই ইলই লামা সবক্তানি।
ঐ ঝোড়ো বিকেলে দুর্যোধন মান্নার ছেলে দুঃশাসন মান্না
সুভদ্রা ঘোড়ুইকে নিয়ে গোপ কলেজের পিছনের জঙ্গলে গিয়েছিল।
সুভদ্রার পিঁপড়ের মতো ভারী জঘন, গভীর নাভি।
বিকেলে ঘন মেঘের ফাঁক দিয়ে জোরালো হাওয়া বইছে–
নতুন আকাশমণিবনের স্খলিত পরাগ উড়ে উড়ে নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল খুব।
ওরা দুজন ঐখানেই দীর্ঘ ঘুমের বন্দোবস্ত করল।
নিম্নাঙ্গের চামড়া সরালে যেরকম রক্তাভ লাল দেখা যায়
ওদের উপর, ভস্ম থেকে ওঠা নতুন শালপাতাও সেই রকম লাল হয়ে উঠল,
কোঁচকানো নীল মেঘস্তরের ফাঁকেও সেই রকম লাল ম্লানতা।

চৈত্রের শেষেও ওরা জাগল না,
ইন ফ্যাক্ট, ওদের খুঁজেই পাওয়া গেল না–
শুধু প্রথম বর্ষার দিনে দেখা গেল
দীর্ঘ সারি দেওয়া পিঁপড়ের লাইন সাদা ডিম মুখে নিয়ে
যেন বার্ষিক গতির উলটো দিকে চলেছে।

আমার শেষ কবিতার বই
মণীন্দ্র গুপ্ত

আমার এই বইটির প্রথম দশটি কবিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্বন্ধাতিশয্যে পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।
তারপর সেগুলির পুনমুদ্রণ ঘটে প্রবাসীতে, কষ্টিপাথর বিভাগে।
সেই সময়েই শাহেদ সারওয়ার্দি আর অপূর্ব চন্দের সঙ্গে
এই কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্তের।

পরবর্তী পনেরটি কবিতা প্রকাশিত হয় গত দশকে
পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনে। কিন্তু
অন্নদাশংকর রায় জানাচ্ছেন, তিনি ঐ পনেরখানাই
তার যৌবনে অনুবাদ করেছিলেন ওড়িয়া
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ডীন জানিয়েছেন,
অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে গুরমুখীতে।
যেদিন রাত্রে কুমারী অরু দত্ত
ঐ কবিতাগুচ্ছের ফরাসী ভাষান্তর পেলেন
সেদিন প্যারিসের সমস্ত বাগানে ফুলেদের আর ঘুম এল না।

বারোক গির্জার দেয়ালে, আব হাম্বুরাবির কোড-এর ফলকে
এই বইটির ২৬ সংখ্যক কবিতা

তাহলে এই কবিতাবলির জন্মউৎস কত দূর অতীতে?
মনে হয়, কুর্মাবতারের শক্ত খোলার পিঠে
প্রলয়সমুদ্রের অন্ধকার নিশীথ জল আর
ফসফরাস আর বালি
অতি ধীর লয়ে
এখনো খোদাই করে চলছে
৬৮ সংখ্যক কবিতা,
যা বইটির শেষ কবিতা।

হলুদ পাখি
আলোক সরকার

দেখেছি হলুদ পাখি আশ্চর্য গলার রঙ। শোনো শোনো
গাঢ় রোদে বাবলার গাছে
দুইটি ডালের ফাঁকে বসেছিলো-নিপুন বানানো যেন কোনো
ছবির মতন-নিশ্চিত গৌরবে ঠোঁট তুলে
বলে দিলো আমি একা, সম্পূর্ণ বিরাম, অলীক নিশ্বাসে
জেগে উঠি, তোমাকে জাগাতে পারি সুদূর জ্যোৎস্নার এলোচুলে।

ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি তুমি এসো প্রস্তুত হাওয়ার
দরজা খুলে দাও দ্রুত উঠে যাও তিনতলার ছাতে
আমিও নিবিড় এক অনুগামী হবো—সংহত আবেগী অকৌশল
সিঁড়ির বাঁকের কাছে সমর্পণে বিদ্যুতের সপ্রাণ সম্ভার
রচনা করবে। হলুদ পাখির কণ্ঠ নিঃস্ব অবিরল
বটের পাতায় মৌনে সমন্বিত-প্রকৃতি নিস্পৃহ অবসাদে।
সারাদিন স্বপ্নের নিভৃতে, গাঢ় জাগরণে বাবলার গাছ
দুটি চোখ সম্ভ্রান্ত নির্দেশ।
তোমার বাড়ির দরজা কেন তুমি বন্ধ ক'রে রাখো? দরজা যদি খোলো
হলুদ পাখির চোখ তোমার নয়নে কেন? প্রীত অনুচ্ছ্বাস
কাছে ডাকে— জ্যোৎস্নার দিঘির কণ্ঠ অকম্পিত নিলীন আবেশ।
আমাকে জাগাও কেন বিশুদ্ধ নিয়মে? স্থির সমারোহে চোখ তোলো?

বন্দীরা
তরুণ সান্যাল

নোনাপানি গলুই ছুঁয়ে পাটাতনে ফেনা ছড়াচ্ছিল,
আমরা তো গরিবগুরবো, নড়েচড়ে যে বসবো তাও কঠিন,
উবু হয়ে ঝড়বন্দী, এ-ওর গায়ে এমন শীতে ঠেসান হয়ে নীল,
সকাল যায় দুপুর যায়, শেষমেষ নুয়ে পড়ল দিন।

সন্ধ্যা না হতেই আলো ঝলমল ইস্টিমার
পাশ কাটিয়ে উড়ে গেল, ছাই থেকে চোখ অবাক বিদেশি বন্দী দেখছিল বউ-ঝিও
কী সুন্দর গোছ পায়ের পাতা ওদের একটুও ফাটা চিহ্ন নেই,
মনে হয় মাথা ঠেকাই, চুমো খাই, মুখ ওখানে ঘষি,
ঝুম ঝুম পায়েল নাকি গয়না-টয়না ওই রকম দেহেরই আত্মীয়

আমরা বসেই আছি, আকাশে ঢাউস চাঁদ সোঁদরবনে শশি
ঘরে গা-ভর মেছো গন্ধ বউ না বিটি একটুও তো ঠাটঠমক নেই

নোনা জল উড়াল ফেনা মুখ ভেজালো, বিদেশি বন্দী তো,
শালপাতায় ঘ্যাঁট-পুরী-হাত পা ধুতে টিনভরতি লবন,
গলা জ্বলে যায়, মেয়েটি ঠিক যেন চাঁদ-ভাসানো দীঘি
জ্যোৎস্না উপছে পড়ছে রূপে
যা রে নাও যা রে মনপবন
একটু ছুঁয়ে আয় ভুরু ঠোঁট গলা নিতম্ব বা স্তন
আহ্ কেবল নোনা পানি ঘোলা জল শুধু ছলাৎছল

পদ্ম তো ফোটে না বাদাবনে গোনে বা বেগোনে কাদা রেখে যায়,
শরীর তো বন্দী দশা কেঠো গলুই আধারে হাতড়ায়।

মহাভারত

কালিকৃষ্ণ গুহ

আমাদের মহাভারত পড়া শেষ হয়নি আজও। একদিন আমি আমার
জরাগ্রস্ত পিতামহকে মহাভারত পড়তে দেখেছি, আজ আমার বালক-পুত্রকে
মহাভারত পড়তে দেখলাম।
পূর্ণাঙ্গ জীবন আর, পাশাপাশি, যুদ্ধের গল্প, নারীর গল্প, বীরত্ব ও ছলনার গল্প,
স্বপ্ন এবং সত্যের গল্প, ধর্ম ও পাপের গল্প, সময় ও শূন্যতার গল্প।
আমাদের চেতনা-প্রবাহের এইসব গল্প শেষ হবে না কোনদিন।

২.

জন্মান্ধের অট্টহাসি থেকে যে যুদ্ধের শুরু
রমণীর উন্মুক্ত কেশরাশি থেকে যে যুদ্ধের শুরু
বিলুপ্ত আত্মপরিচয় থেকে যে যুদ্ধের শুরু
অজ্ঞাতবাসের নীরবতা থেকে যে যুদ্ধের শুরু
দীর্ঘ নিদ্রাহীনতা ও ছদ্মবেশ থেকে যে যুদ্ধের শুরু
তাকে আজ ঢেকে দিয়েছে মাঘমাসের কুয়াশা।

মাঘমাসের কুয়াশা কোলাহলহীন মহাভারতকে ঢেকে দিয়েছে আজ।

যে লেখাটি সোমনাথকে দিয়েছিলাম

(৪ মে ২০১২)

অমিতাভ গুপ্ত

এখানো প্রাণের শেষ নেই
এখানো মরণ ফুরোলো না

যাকে আজ সম্পূর্ণ জানিনা
শুধু যার অজ্ঞতাকে চিনি

অন্য কোন্ অন্তহীন দূরে
কাছে অলক্ষ্য পড়ে আছে

ধাবমান উদ্দেশ্যরহিত
অপেক্ষার মতো পথ চেয়ে

রুদ্রাক্ষরেখার মতো পথ
দিনান্তের ধ্যানের উদ্বেগ

বুকে তুলে নিয়ে অশেষের
অবসানে প্রাণে ও মরণে

বিভাজিত দীর্ণ রক্তমুখ
গোধুলিটি নিক্ষেপ করেছে

আড্ডা চার

নমিতা চৌধুরী

আমরা ভাইবোনেরা যখন আড্ডা দিই তখন
সে এক অদ্ভুত ব্যাপার
আকাশে সন্ধ্যাতারা ফুটে ওঠে
আমাদের গল্প শুরু হয়
চাঁদ ওঠে
আমাদের কথা তখন সবেমাত্র কয়েক পা এগিয়েছে
যখন চাঁদ মধ্যগগনে
তখন গল্পের মই বেয়ে চাঁদকে
আমরা প্রায় ছুঁয়ে ফেলি আরকি
চাঁদ অস্ত গেলে দেখি
বস্তুত একই জায়গায় আমরা বসে আছি

আমরা ভাইবোনেরা যখন আড্ডা দিই
তখন দেখি সব অদ্ভুত ব্যাপার
আমাদের খিদে তেষ্টা এক্কেবারে থাকে না
আর একটা গাছ মাথার উপর বেশ ছায়া দেয়
আর একটা সোনার পাখি অনবরত
একটা না একটা অমৃতফল ঠুকরে ঠুকরে
আমাদের কাছে ফেলতে থাকে
আমরা কেউ না কেউ লুফে
নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিই

এইভাবে আড্ডায় আমরা আস্তে আস্তে
বুনে তুলি একটা আশ্চর্য কমলারঙের
বিশাল চাদর।

প্রতিদ্বন্দ্বী

বিশ্বনাথ ঘোষ

অচেনা পাখির শিস শুনতে শুনতে রাস্তা পার হয় সিদ্ধার্থ
হাতে খবরের কাগজে পাকানো সার্টিফিকেট
যে সমাজের দেওয়া অকেজো অভিজ্ঞানপত্র নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা
আজ ইন্টারভিউ—সংসারের নিরাপত্তার জন্য ভীষণ জরুরী স্যালাইন।

সে তার বিপন্নতা, অসফলতা এবং কোলকাতার দুঃস্বপ্নের মধ্যে
শেষ উপার্জনশীল প্রতিপালকের চিতার ওধারে দাঁড়িয়ে
শুনতে থাকে মারচিং ড্রামের ধ্বনি পজিটিভ টোনে।
তবু ভয়াবহ স্বপ্নদৃশ্যের মধ্যে দুলতে থাকে তার সংকটময়তা
আর তখনই পিয়ানোর টুং টাং শব্দ শুনতে পায় সিদ্ধার্থ
সে আর কেয়া ফিরে আসে জলের ধারে, আলোর কিনারে
ধরা দেয় কুসুমের গন্ধ আমোদিত দৃশ্যপট বদলাতে থাকে।
তবু ভাবনার স্রোত কুরে কুরে খায় তাকে।
এই কর্মহীন শহরে ঘরবাড়ি, লোকজন, বিজ্ঞাপনের মুখ ও মুখোশ
দেখতে দেখতে সে স্থিতাবস্থা ভাঙার সংকল্পে
জন্তুর মতো ক্রোধে ফেটে পড়ে অপরাহ্নে
উল্টে দেয় ইন্টারভিউ বোর্ডের টেবিল, কাগজ, দোয়াত
কালি ছিটকে পড়ে দেওয়ালে-আবহে রচিত হয় নাকাড়ার ধ্বনি।
শববাহকের ধ্বনি ওই সময় বিলুপ্ত হয় পারদ চড়তে থাকে
তৈরি হয় রহস্য, আনন্দ ও বিষাদের
খুলে যায় দরজা অচেনা পাখির অসমাপ্ত সুরে।